আধুনিকতার প্রতীক : শিবনারায়ণ রায়

গোলাম মুরশিদ

গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে বাংলা ভাষায় যাঁরা প্রাবন্ধিক হিসেবে সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের একজন শিবনারায়ণ রায়। তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যেমন বিচিত্র, তেমনি তাঁর প্রকাশভঙ্গিও বিশিষ্ট। তাঁর প্রবন্ধ এর চেয়েও বেশি উল্লেখ্যযোগ্য মৌলিক চিন্তা এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাবনাকে উসকে দেওয়ার মতো বক্তব্যের জন্যে। আমাদের কালের সেই শ্রেষ্ঠ প্রাবন্ধিক মনীষী শিবনারায়ণ রায় (১৯২১-২০০৮) গত ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি চলে গেলেন। সকালবেলায় চা-বিস্কুট খেয়ে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছিলেন। গীতা বৌদি নিয়ে গিয়েছিলেন প্রাতরাশ নিয়ে আসতে। নিয়ে এসে দেখলেন, তিনি আর নেই। তাঁর বয়স হয়েছিল সাতাশি বছর এক মাস। অকালে মারা গেছেন সে-কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। যেভাবে গেছেন তাও সর্বোত্তম উপায়। আগের দিন সভায় ভাষণ দিয়েছেন। দুদিন আগে একটা বইয়ের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মোটামুটি সুস্থ ছিলেন। তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ— তিনি ছিলেন পুরোমাত্রায় সৃজনশীল।

ছাত্রজীবন থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি প্রায় পঞ্চাশটি বই লিখেছেন ইংরেজি এবং বাংলায়। সম্পাদনা করেছেন প্রায় তিরিশটি গ্রন্থ। সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, আর নয়— এবারে লিখবেন আত্মজীবনী। সেই জীবনী লেখার জন্যে দুজন তরুণ-তরুণীকে নিয়োগও করেছিলেন—যাঁদের কাজ হবে আত্মজীবনী লেখার জন্যে ডায়েরি, চিঠিপত্র এবং খবরের কাগজের কাটিং ইত্যাদি ঠিকমতো গুছিয়ে দেওয়া।

শিবনারায়ণ রায় অধ্যাপনা করেছেন প্রধানত কলকাতা, শিকাগো আর মেলবোর্নে। কিন্তু অতিথি অধ্যাপক হিসেবে কোথায় যে যাননি, সেটা বলা শক্ত। আফ্রিকা ছাড়া, প্রতিটি মহাদেশে তিনি অনেক বিচরণ করেছেন অতিথি অধ্যাপক হিসেবে। যাঁদের সঙ্গ তাঁর দীর্ঘজীবনের যোগাযোগ ঘটেছিল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বার্ট্রান্ড রাসেল, টি. এস. এলিয়ট, জঁ পল সার্ত্র, অ্যালবার্ট কাম্যু, মানবেন্দ্রনাথ রায়, জুলিয়ান হাক্সলি, এডিথ সিটওয়েল, সিমোন দ্য বোভোয়ার, আঁদ্রে মালরো প্রমুখ। তাঁর যাঁরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু তাঁদের মধ্যে ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, নীহাররঞ্জন রায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, গৌরকিশোর ঘোষ অম্লান দত্ত প্রমুখ। সুতরাং তিনি আত্মজীবনী লিখলে, সে - জীবনীর মধ্য দিয়ে আমরা যে গোটা বিশ্বের স্বাদ খানিকটা পেতাম, তা বলা বাহুল্য। কিন্তু মানুষের সব আশা কি পূরণ হয়? তাঁর এবং আমাদের খানিকটা সাধও অপূর্ণ থেকে গেল।

ব্যক্তিগতভাবে আমার ক্ষোভের পরিমাণ অবশ্য সীমিত। সীমিত বলছি এ-জন্যে যে কাছাকাছি থেকে তাঁকে দেখার এবং তাঁর সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেয়েছি তিরিশ বছর। এই তিরিশ বছরের এন্তার স্মৃতি মনে ভিড় করে আছে। এই মুহূর্তে ভিড় করে আসছে।

মনে আছে, তাঁকে প্রথম দেখি তেত্রিশ বছর আগে। কিন্তু আজো সে-স্মৃতি আদৌ ম্লান হয়নি। দেখার অনেক আগে থেকেই তাঁর নাম জানতাম, কিন্তু তাঁর কোনো বই পড়েছি বলে মনে হয় না। তিনি মস্ত পণ্ডিত, তা জানা সত্ত্বেও পড়িনি। আসলে, আবোলতাবোল কিছু লেখাপড়া করলেও, আমার পড়াশোনার পরিধি নিতান্ত সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান নিয়ে যাত্রা করে শেষে সাহিত্যের দিকে এসেছিলাম। সেটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু কোনো কৈফিয়ত দিয়েই আমার নিজের অজ্ঞানতা ঢেকে রাখতে চাই না। সে যাই হোক, বন্ধুদের নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবিদ্যা ভবনে তাঁর বক্তৃতা শুনতে গিয়ে সামনাসামনি দেখেছিলাম তাঁকে। আমরা তখন প্রতি সন্ধেয় প্রখ্যাত ভারতবিদ্যা বিশারদ অধ্যাপক ডেভিড কফের সঙ্গে কয়েক ফোঁটা হুইস্কি সহযোগে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের নেশা করতাম। শুনেছিলাম যে, অধ্যাপক রায় নাকি আমাদের সেই সযত্নে লালিত চিন্তাধারা সমর্থন করেন না। কাজেই বক্তৃতায় গিয়েছিলাম, লাগলেই যুদ্ধে নেমে পড়ব—এই মনোভাব নিয়ে।

আগের দিনই অতিথি ভবনে দূর থেকে শিবনারায়ণ রায়কে দেখেছিলাম উজ্জ্বল, কারো কারো মতে উৎকট, রঙের পোশাক পরে ঘোরাঘুরি করতে। সেমিনার কক্ষে গিয়েও দেখলাম, তাঁর পোশাক সবার থেকে আলাদা— চোখে পড়ার মতো। যা পরেন, তা থেকে শত মানুষের ভিড়ের মধ্যেও তাঁকে চোখে না-পড়ে পারবে না। বক্তৃতা শুরু করার পর লক্ষ করলাম, তাঁর বক্তব্য এবং কথা বলার ভঙ্গিও খোলা তলোয়ারের মতো। তাঁর বক্তব্য ধারালো, উসকানিমূলক এবং বলিষ্ঠ। নিজের কথাটা অসংকোচে জোরের সঙ্গে বলতে আদৌ দ্বিধা করেন না। তথ্য আর তত্ত্ব পরিবেশন করতে করতে কখনো কখনো নিজেকে সামনে নিয়ে আসেন। তাঁর সেই প্রথম বক্তৃতা শুনে তাঁর সম্পর্কে যে-ধারণা হয়েছিল, তা হল: তাঁর নাম আর যা-ই হোক, স্বামী বিনয়ানন্দ নয়। তাঁর সঙ্গে কথা বলে কারো তাঁকে দাম্ভিক বলে মনে হলেও অবাক হব না। এছাড়া, তাঁর কথা শুনে মনে হল যে, দু-দুটি প্রধান দেবতার নাম দিয়ে তাঁর নাম রাখা হলেও দেব-দ্বিজে তাঁর আদৌ ভক্তি নেই।

এখন আর মনে নেই, সে-বক্তৃতায় তিনি ঠিক কী বলেছিলেন। কিন্তু ছেঁদো কথা যে নয় সেটা হলফ করে বলতে পারি। বিতর্কিত কথা না-বলে উনি পারেন না। ফলে বক্তৃতার শেষে প্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে অনেকেই তাঁকে নানারকমের প্রশ্ন করেছিলেন এক ধর্মান্ধের প্রশ্নে। সত্যিকারের উত্তরটা দেওয়া বিবেচনার কাজ হবে কি না। সমস্যাটা তিনি খুব চতুরতার সঙ্গে মোকাবিলাও করেন। ধর্মের ব্যাপারে প্রশ্নকর্তার খুব তেজ থাকলেও ইংরেজিতে যে তেজ ছিল না, সেটা উনি ঠিকই অনুমান করেছিলেন। সেজন্যে বললেন যে, ওই প্রশ্নটার উত্তর তিনি দিতে চান ইংরেজিতে। অমনি জোঁকের মুখে চুন।

উনিশ শতকের সঙ্গে বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের তুলনা করে তিনি বলেছিলেন, যে, বিদ্যাসাগর প্রতিবাদ করে তাঁর চাকরি ছেড়ে দিতে পেরেছিলেন, কিন্তু এখনকার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একজনও নেই যিনি তাঁর বড়ো চাকরি ছেড়ে দিতে পারেন। বদরুদ্দিন উমরের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে প্রতিবাদটা আমিই করেছিলাম। নিজের নাম বলে আমি যখন আমার মন্তব্য করলাম, তখন উনি প্রথমেই আমাকে বিস্মিত করে বললেন যে, আমার - সম্পাদিত বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থটি উনি পড়েছেন। বাংলাদেশে গিয়ে সেবারে উনি বেশ কয়েক সপ্তাহ ছিলেন এবং বাংলাদেশের সাহিত্য ও সমাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হতে চেষ্টা করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের খুব কম বুদ্ধিজীবীই তখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে এসে বাংলাদেশের নতুন সমাজ ও সংস্কৃতির আস্বাদ নিয়েছিলেন।

আলোচনা - সভায় দেখা হলেও, রাজশাহীতে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার সুযোগ হয়নি, কারণ সেই রাতেই তিনি হঠাৎ জলবসন্তে আক্রান্ত হলেন এবং ফিরে গেলেন ঢাকায়। তার সাড়ে তিন বছর পরে— ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে— তাঁর সঙ্গে দেখা হয় মেলবোর্ন বিমানবন্দরে। পরিবারসহ আমি সেখানে গিয়েছিলাম পোস্ট-ডক্টরাল ফেলোশিপ নিয়ে। আমাদের নিয়ে যেতে বৌদিকে সঙ্গে করে তিনি এয়ারপোর্টে এসেছিলেন। তারপর তাঁরই তত্ত্বাবধানে আমি ভারতবিদ্যা বিভাগে দু-বছর গবেষণা করেছিলাম। তাঁর সঙ্গে সত্যিকার পরিচয় হল তখনই।

আমি যখন ফেলোশিপের জন্য দরখাস্ত করি, মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তখন নিশ্চয় তাঁর মতামত নিয়ে থাকবে। এবং তিনি নিশ্চয় ধারণা করে থাকবেন যে, আমি ভালো কিছু করতে পারব। কিন্তু প্রথম সপ্তাহের সেমিনারেই তিনি বোধহয় আমার আলোচনায় হতাশ হয়েছিলেন। কারণ অ্যাকিলিসের গোড়ালির মতো আমারও একটা গোপন দুর্বলতা ছিল— সেটা ইংরেজিতে, বিশেষ করে মৌখিক ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প নিয়ে সেই সেমিনারে যে-আলোচনা হয়, তাতে আমি ফোঁস করে উঠলেও দুর্বল ইংরাজির কারণে ফণা মেলতে পারিনি। তার ফলে আমি আমার আত্মবিশ্বাস ষোলো আনা হারিয়ে ফেলি। পরে দু-বছরের মধ্যেও তা আর ফিরে পাইনি। এমনকি, প্রায় সিকি শতাব্দী বিলেতে বাস করলেও এখনো যে আমি ইংরেজিতে খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করি, তা অসংকোচে বলতে পারিনে।

আমি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেললেও এই আলোচনা সভাতেই অনেককে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে দেখেছিলাম। ভারতবিদ্যা বিভাগে তখন আট-ন'জন এম.এ. করছিলেন। পিএইচ-ডি. করছিলেন তিনজন। তার মধ্যে ম্যারিয়ান ম্যাডার্ন বাংলা ভাষাতত্ত্ব নিয়ে ভালো কাজ করেছিলেন। পলেন রুলও কলকাতা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন। এলিজাবেথ বস্কোভাস্কি তাঁর পিএইচ-ডি. গবেষণা করেন রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের ছবি আর কবিতার যোগাযোগ নিয়ে। তার আগে মেরেডিথ বর্থউইকও গবেষণা করেছিলেন এই বিভাগে। এঁরা সবাই কাজ করেন শিবনারায়ণ রায়ের অধীনে। এই আলোচনা সভায় তাঁরা সবাই যোগ দিতেন এবং নিজের নিজের ভাবনা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নিতেন। অন্যদের চিন্তা দিয়ে আলোকিত হতেন।

তাঁর সবচেয়ে বড়ো গুণ ছিল, তিনি তাঁর ছাত্রদের স্বাধীনভাবে ভাবতে শেখাতেন। এটা যে কতো বড়ো গুণ, তা বুঝতে পেরেছিলাম নিউজিল্যান্ডের একটি উনিশ-বিশ বছর বয়সী আন্ডারগ্র্যাজুয়েট ছাত্রীর আলোচনা থেকে। মেয়েটি রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা নিয়ে একটি আলোচনা উপস্থাপন করে এই সাপ্তাহিক সেমিনারে। রবীন্দ্রনাথ সে বেশি পড়েনি, যা কিছু পড়েছিল, তা আবার পড়েছিল অনুবাদের মাধ্যমে। কিন্তু সে রবীন্দ্রনাথকে নিজের মতো করে দেখতে শিখেছিল। সে মন্তব্য করে যে, রবীন্দ্রনাথের নারীভাবনা দ্বিধামুখী এবং পরস্পরবিরোধী। সৃজনশীল রচনায় তাঁর নারীরা প্রচলিত সমাজ, এবং মূল্যবোধের বিরোধী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা রীতিমতো বিদ্রোহী। অপরপক্ষে, প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নারীদের প্রশংসা করেছেন, তাদের সনাতন মূল্যবোধের জন্য; সহিষ্ণুতা, প্রেম এবং আত্মত্যাগের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কয়েকশো বই লেখা হয়েছে। সেই গৎবাঁধা বইগুলোতে কোথাও এই মৌলিক ভাবনা নেই। কিন্তু অধ্যাপক রায়ের উৎসাহে সেই তরুণী বিদেশিনী এই মৌলিক চিন্তা প্রকাশ করেছিল।

এই সেমিনারে কেবল বিভাগের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা আসতেন না। অন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও অধ্যাপকরা আসতেন। আমি থাকতে থাকতে বিভাগে অতিথি অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন অম্লান দত্ত। তিনিও নিয়মিত যোগ দিতেন এই সেমিনারে। আমি নিজে এই সেমিনারে বিশেষ কোনো অবদান রাখতে না - পারলেও, এই সেমিনারের মুক্ত আলোচনা দিয়ে খুব উপকৃত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিল যে, এরকম আলোচনা করার একটা ফোরাম থাকলে ছাত্রছাত্রীরা সত্যি সত্যি উপকৃত হতে পারে। সেজন্যে দেশে ফিরে আমার টিউটোরিয়ালের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আমি একটি নিয়মিত সাপ্তাহিক সেমিনারের ব্যবস্থা করি। আমাদের দেশের শিক্ষা এবং সমাজের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে থেকে পরে স্বরোচিষ সরকারসহ বেশ কয়েকজন পিএইচ-ডি. করেছিলেন। নানা বিষয়ে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন।

মেলবোর্নে আমি নিজের মতোই কাজ করতাম। সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রতি উনিশ শতকের বাঙালি মহিলারা নিজেরা কেমন প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, আমার গবেষণার বিষয় ছিল তাই। অধ্যাপক রায় তাতে কখনো নাক গলাতে আসেননি। অথবা বিশেষ কোনো পথে আমার গবেষণাকে পরিচালিত করতেও বলেননি। আমার পিএইচ-ডি.-র কাজ আমি করেছিলাম প্রখ্যাত ভারতবিদ্যা - বিশারদ ডেভিড কফের অধীনে। বিষয় ছিল : হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও বাংলা নাট্য - রচনায় তার প্রতিফলন। এই আন্দোলনের সিংহভাগটাই ছিল হিন্দু মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করার আন্দোলন। সুতরাং মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার গবেষণার বিষয়টা আমার আগে থেকেই মোটামুটি জানা ছিল।

নতুন যা জানার ছিল, তা হল : মহিলারা এই আন্দোলনের প্রতি কীভাবে এবং কতোটা সাড়া দিয়েছিলেন। এজন্যে আমি সমসাময়িক মহিলাদের রচনা (প্রায় ছ'হাজার পৃষ্ঠা) দেশ থেকে ফটোকপি করে নিয়ে গিয়েছিলাম। এই লেখাগুলোর বেশির ভাগই পেয়েছিলাম বামাবোধিনী পত্রিকা-র পাতায়। বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে এই পত্রিকার পুরোনো সংখ্যা ছিল চল্লিশ বছরের (১৮৬৩-১৯০৩)।

কাজ শুরু করার মাস কয়েক পরে আমি আমার পরিকল্পিত গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি শেষ করি। এর নাম দিয়েছিলাম লিড কাইন্ডলি লাইট : রেসপন্স অব বেঙ্গলি উইমেন টু এজুকেশন। পরে আমি যখন এই বইয়ের অনুবাদ করি তখন এই অধ্যায়ের নাম দিয়েছিলাম : অন্ধজনে দেহো আলো: শিক্ষার প্রতি বঙ্গনারীদের প্রতিক্রিয়া। এ অধ্যায়ের শেষে আমার নিজের বক্তব্য ছিল স্ত্রীশিক্ষার সীমিত সাফল্য-সম্পর্কে। আশা করেছিলাম যে, অধ্যাপক রায় অধ্যায়টি পড়ে ভালোই বলবেন। কিন্তু কদিন পরে উনি যখন আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর মন্তব্য দিলেন, তা কেবল আমার এই অধ্যায় সম্পর্কেই সঠিক নয়, কমবেশি প্রযোজ্য বাঙালি পাণ্ডিত্য সম্পর্কেই।

উনি বললেন যে, আমার লেখায় প্রচুর তথ্য আছে, কিন্তু আমার কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণাগত কাঠামো নেই। আমি কোন্ দৃষ্টিকোণ থেকে এসব তথ্য পরিবেশন করে কোন্ উপসংহারে পৌঁছাতে চাইছি, তা পরিষ্কার নয়। অর্থাৎ আমি যেসব তথ্যের ইট -পাথর জড়ো করেছি, তা দিয়ে ঠিক কী ধরনের ইমারত গড়ে তুলতে চাইছি, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ছেলেবেলা থেকে আমি আর-পাঁচজন বাঙালির মতো গোরুর রচনা লিখতে শিখেছি। গোরুর যে দুটো অথবা তিনটে নয়, চারটে পা আছে, একটা লেজ আছে, এমনকি, লেজের মাথায় একগুচ্ছ কেশ আছে— এসবই লিখতে শিখেছি। কিন্তু লিখতে শিখিনি তৃণভোজী গোরু, অথবা গৃহপালিত জন্তু গোরু অথবা উপকারী জন্তু হিসেবে গোরুর কথা। অধ্যাপক কফের সঙ্গে কাজ করার সময়ে ধারণাগত কাঠামোর কথাটা শিখেছিলাম। এমনকি, আমার অভিসন্দর্ভের প্রতিটি অধ্যায়ের একটা করে ধারণাগত শিরোনামও আছে, কিন্তু জিনিসটা আমার আয়ত্তে আসেনি। অধ্যাপক রায়ের কাছে আমার জ্ঞানবুদ্ধি অনুযায়ী ব্যাপারটা আমি মোটামুটি বুঝতে শিখি। এ-যে কত বড় অর্জন, এখন তা আমি উপলব্ধি করতে পারি।

অধ্যাপক রায় আমার সেই প্রথম অধ্যায়-সম্পর্কে আরো বলেছিলেন যে, অধ্যায়ের শেষে আমি স্ত্রীশিক্ষা নিয়ে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছি, সেসব প্রশ্নের উত্তরই এ-অধ্যায়টিতে গুরুত্ব পাওয়া উচিত। তথ্যের প্রতি আমি যত্ন দেখিয়েছি, সেই যত্ন আমার দেখানো উচিত সেসব তথ্য বিশ্লেষণের দিকে।

বস্তুত, তাঁর কাছে তথ্যের চেয়ে বিশ্লেষণ জিনিসটার কদর ছিল ঢের বেশি। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজে কী কী ঘটেছিল— কেবল এটা শুনতে তিনি আগ্রহী নন। কারণ তিনি ধরেই নিতে চান যে, পাঠক সেটার খবর রাখেন। তিনি বরং শুনতে চান এসব ঘটনা কেন ঘটেছিল, তা কতোটা সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। স্ত্রীশিক্ষা সংক্রান্ত উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি : স্ত্রীশিক্ষা কখন শুরু হল, কীভাবে তা ছড়িয়ে পড়ল এবং তার ফলে কতোজন লাভবান হলেন— এ তথ্য তাঁর কাছে অমন জরুরি নয়। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সমাজ কেন সচেতন হল, সমাজের সব অংশ কেন সচেতন হল না, স্ত্রীশিক্ষা দেওয়ার মতো অনুকূল পরিবেশ কীভাবে এবং সমাজের কোন অংশে তৈরি হল, কোথায় বাধা থেকে গেল, এতো আয়োজন সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার সীমিত সফলতার কারণ কী, এই শিক্ষা নারীদের মন-মানসিকতার ওপর কতোটা প্রভাব বিস্তার করল, যে-পুরুষরা গোড়াতে স্ত্রীশিক্ষার পক্ষে ওকালতি করেছিলেন, পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে তাঁদের মনোভাব কেন বদলে গেল— ইত্যাদির বিষয়ে জানতে বরং তিনি বেশি আগ্রহী।

আমার ধারণা, আমি বেশি বিশ্লেষণ করতে শিখিনি। প্রশ্ন করতে শিখিনি। জানা তথ্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার মতো ক্ষমতাও আমার সীমিত। কিন্তু চেষ্টা করে এই কৌশল যতোটা শিখতে পেরেছি, তার অনেকটাই শিবনারায়ণ রায়ের সান্নিধ্যে এসেই শিখেছি। প্রত্যেক মানুষেরই কিছু সুপ্ত ক্ষমতা থাকে অঙ্কুরের মতো। তাকে উসকে দিলে সে আলোর দিকে তাকায়। শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। কিন্তু একজন ভালো শিক্ষক একজন শিক্ষার্থীর সুপ্ত শক্তি এবং সম্ভাবনাকে জাগিয়ে দিতে পারেন। শিবনারায়ণ তেমনি আমার যেটুকু সম্ভাবনা ছিল, তাকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

অন্যের ঘুমন্ত শক্তিকে জাগ্রত করার আরেকটা দায়িত্ব তিনি পালন করেছিলেন জিজ্ঞাসা পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে। জীবনের শেষদিকে কয়েক বছর শারীরিক অক্ষমতা এবং সময়ের অভাববশত জিজ্ঞাসা-র জন্যে তিনি অতোটা কাজ করতে পারেননি। কিন্তু গোড়ার দিকে তিনি এর পাতায় যাঁদের দিয়ে লিখেছিলেন, তাঁরা অনেকেই তার আগে পর্যন্ত বাংলায় কিছু রচনা করেননি। অথবা ঢাকা-কলকাতার পত্রিকায় লেখার কথা কখনো ভাবেননি। শিবনারায়ণ রায়ের কৃতিত্ব এই যে, তিনি তাঁদের রাজি করাতে এবং বাংলায় লেখার আত্মবিশ্বাস জোগান দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। প্রথম দিকে জিজ্ঞাসা-য় যে বিচিত্র বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হত, সমকালীন অন্য কোনো বাংলা সাহিত্য পত্রিকায় তা হয়নি।

জিজ্ঞাসা-র অনেকগুলো বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশ করেছিলেন তিনি— পাঠকদের সঙ্গে নানা বিষয়ের পরিচয় করিয়ে দিতে। পাশাপাশি বাস করলেও পশ্চিম বাংলার অনেক পাঠকই বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির খবর রাখেন না। বাংলাদেশকে তাঁদের কাছে পরিচয় করিয়ে দিতে তিনি তাই জিজ্ঞাসা-র দুটি সংখ্যা প্রকাশ করেন। ডিরোজিও, রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলকে নিয়েও তিনি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছিলেন। তাছাড়া, এখন থেকে প্রায় কুড়ি বছর আগে পরিবেশ দূষণ নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন এ-বিষয় পাঠকদের সচেতনতা জাগিয়ে তোলার জন্যে। তাছাড়া, প্রকাশ করেছিলেন আফ্রিকা, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কয়েকটি সংখ্যা।

মানুষকে অনুপ্রাণিত করার এবং চলার পথনির্দেশনা দেওয়ার তাঁর ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। একটা ঘটনা এই

প্রসঙ্গে না-বলে পারছি না। ১৯৮৬ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডনে এসেছিলেন একটি সেমিনারে যোগ দিতে। একদিন খাবার টেবিলে বসে মাইকেল মধুসূদন সম্পর্কে লেখা একজনের একটি অভিসন্দর্ভ নিয়ে আলোচনার সময়ে তিনি বললেন যে, লন্ডনে মাইকেলের জীবনী সম্পর্কে অনেক তথ্য থাকা সম্ভব। এই কথার সূত্র ধরেই আমি কদিন পরে ইন্ডিয়া অফিসে মাইকেলকে নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করি তার আট বছর পরে আমার আশার ছলনে ভুলি গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু শিবনারায়ণ এই পথের ইঙ্গিত না-করলে আমি এ-পথে আদৌ পা বাড়াতাম না।

হাসান আজিজুল হকের খ্যাতি ছোটোগল্পকার হিসেবে। তাঁকে তিনি মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি দিয়ে নিয়ে যান উনিশ শতকের বাংলার মননশীলতার ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করার জন্য, বিশেষ করে পশ্চিমা দর্শন কিভাবে আমাদের চিন্তা-চেতনাকে ধীরে ধীরে প্রভাবিত করেছিল— সেই ইতিহাস নিয়ে কাজ করার জন্যে। হাসান কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু মানসিক বিষণ্ণতার কারণে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হন। নয়তো অধ্যাপক রায় ঠিকই ধরেছিলেন যে, দর্শনের পটভূমি নিয়ে হাসান অবশ্যই এ-ইতিহাস লিখতে সক্ষম হবেন।

নতুন ধারণা নিয়ে চিন্তা করাই নয় অথবা অন্যকে অনুপ্রাণিত করাই নয়, তাঁর চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিতর্ক করা। বিতর্কিত প্রসঙ্গ উত্থাপন করা। আগেই বলেছি, যে-পথ দিয়ে আগের সবাই গেছেন, অন্ধভাবে সেই পথে চলার মতো মানসিকতা তাঁর ছিল না। লক্ষ করেছি, রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং মাইকেল সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ এবং দুর্বলতা একটু বেশিই ছিল। তাঁর কারণ হয়তো এই যে, তিনজনই স্রোতের বিরুদ্ধে চলেছিলেন। ডিরোজিও এবং নজরুল সম্পর্কে তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও অনেকটা এই কারণে। বস্তাপচা অথবা মন-জোগানো কথা বলতে তিনি পছন্দ করেননি কোনোদিন। চর্বিত চর্বণ তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। কিন্তু সমাজের পাঁচজন দাঁত বের করে হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন বলতেই অভ্যস্ত। পরস্পর পৃষ্ঠকন্ডূয়ন করেই বেশি উপভোগ করেন। স্রোতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস এবং শক্তি বেশির ভাগ মানুষেরই থাকে না। তাঁর সে-শক্তি ছিল বিপুল পরিমাণে।

তিনি ছিলেন সত্যিকার অর্থে একজন আধুনিক মানুষ। সত্যিকার বললাম এজন্যে যে, পঞ্জিকার হিসেবে আমরা সবাই বিংশ শতাব্দীর মানুষ। সে-অর্থে আধুনিক। কিন্তু এখনো আমরা অনেকেই চিন্তা করি মধ্যযুগের মানুষের মতো। মধ্যযুগীয় গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা আমাদের চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে-পথে বেশির ভাগ মানুষ চলেছেন, যে-মূল্যবোধ সমাজের বেশির ভাগ মানুষের বিশ্বাস, নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে সেই পথে আমরা চলি এবং সেই মূল্যবোধ দিয়ে জগৎ এবং জীবনকে বিচার করি। শিবনারায়ণ রায় সেরকমের মানুষ ছিলেন না মোটেই। তিনি ব্যক্তি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন। আপোসহীন মনোভাবের দরুণ তিনি দরকার হলে একা চলতে হবে— এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সমাজ কী বলবে এটা তিনি সাহসের সঙ্গে অবজ্ঞা করতে পারতেন। তাঁকে প্রথম বুটিকের কাজ করা লুঙ্গি পরে সভায় যেতে দেখি। তাতে কে কী মন্তব্য করবে— সেটা তিনি পরোয়া করতেন না। বরং মনে হয় অন্যেরা সমালোচনা করবেন— এটা তিনি বেশি উপভোগ করতেন। গড্ডলিকা স্রোতে গা না-ভাসানোর জন্যে অন্যেরা সত্যি সত্যি তাঁর সমালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি তা আমলে আনতেন না।

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে বলে যে, যাঁদের জন্ম বৃশ্চিক রাশিতে তাঁদের নাকি অন্যরা ভুল বোঝে। অধ্যাপক রায়ের জন্মও বৃশ্চিক রাশিতে কি না, তা আমার জানা নেই। কিন্তু অন্যরা তাঁকে যে বিলক্ষণ ভুল বোঝেন অথবা বুঝতেন— এটা আমার ভালো করেই জানা। দাম্ভিক থেকে শুরু করে সি.আই.এ.-র দালাল পর্যন্ত তাঁর ছিল বহু অপবাদ। তাঁকে দাম্ভিক বলে মনে করা অসম্ভব নয়, কারণ আত্মমর্যাদাকে অনেকেই দাম্ভিকতা এবং অহংকারের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু কী করে কেউ কেউ তাঁকে সি.আই.এ.-র দালাল মনে করত। আমার আক্কেলে আসে না।

একসময়ে তিনি মার্ক্সবাদী ছিলেন। মার্কসীয় দর্শন যে একটি শ্রেষ্ঠ দর্শন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-দিয়ে ইতিহাসের যে-ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা অসাধারণ এবং অভিনব। কিন্তু একসময়ে তিনি উপলব্ধি করেন যে, এ-দর্শন দিয়ে পৃথিবীর তাবৎ ঘটনার অথবা বিষয়ের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। এতে ব্যক্তির ভূমিকাও অবজ্ঞা করা হয়েছে। বিশেষ করে মার্কসীয় দর্শনের নামে রাজনৈতিক ক্ষমতালোভীরা যেভাবে ক্ষমতা লাভ করেন অথবা/ এবং একবার ক্ষমতায় গিয়ে তাকে আঁকড়ে থাকেন, সেটাকে ঠিক মানবিক বলে আখ্যায়িত করা যায় না মার্ক্সীয় দর্শনের নামে মানুষের মঙ্গল করতে গিয়ে মানুষের ওপর উৎপীড়ন করা, ব্যক্তির বদলে রাষ্ট্রের নামে মানুষকে শোষণ করা— এক কথায় মার্ক্সের রাজনৈতিক একপ্লয়টেশন— সেটা দেখে যদি মার্ক্সবাদের প্রতি কারো শ্রদ্ধা বিচলিত হয়, তবে তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক নয়।

কিন্তু মুশকিল হল : মার্কসবাদও অনেকের কাছে একটা ধর্মের মতো। এবং সে-ধর্ম কোনো উদার ধর্ম নয়, বরং কট্টর ধর্ম। কেউ ধর্মত্যাগ করলে কোনো কোনো দৈবধর্মের অনুসারীরা যেমন তাঁকে হত্যা করার ফতোয়া দেন, তেমনি শিবনারায়ণ রায়ও মার্ক্সবাদ থেকে সরে যাওয়ায় অনেকের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় পাপ করে ফেলেছিলেন। এজন্যে সি.আই.এ.-র দালাল বলেও তাঁকে গাল শুনতে হয়েছে মার্ক্সবাদীদের কাছ থেকে।

ঠিক কীভাবে মার্ক্সবাদের প্রতি তাঁর একসময়কার ইমান বিচলিত হয়, তা নিয়ে আমি কখনো তাঁর সঙ্গে আলোচনা করিনি। আলোচনা না-করেই অবশ্য একটা কথা বুঝি যে, মার্ক্সীয় দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধা হারানো এক কথা, আর সি.আই.এ.-র দালাল হওয়া অন্য জিনিস আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষার নানা সৌন্দর্য আছে, কিন্তু ভাষাটি যে ফেনানো, তাতে সন্দেহ নেই। অতিশয়োক্তি আমাদের ভাষার অন্যতম প্রধান অলঙ্কার। আমাদের চরিত্রেও একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বিশেষণ-প্রিয়তা এবং অতিশয়োক্তি। আমাদের কাছে কেউ শ্রদ্ধাভাজন হলে তাঁর মতো মানুষ কোনোকালে ভূভারতে জন্মগ্রহণ করেননি।

তাঁর পাদক খাওয়াও পুণ্যের কাজ। আবার কাউকে আমরা পছন্দ না-করলে তাঁর মতো খারাপ মানুষ কোনোকালে কেউ দেখেছে কি না, তা নিয়ে আমরা সন্দেহ করি। সুতরাং একজন মার্ক্সবাদী পরিণত দৃষ্টি দিয়ে মার্ক্সবাদকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আমাদের সন্দেহ হতেই পারে যে, তিনি সি.আই.এ.-র দালাল নিযুক্ত হয়েছেন। হতেই পারে কেন, হতেই হবে। তবে মার্ক্সবাদীদের চোখে যেমনই হন না কেন, মুক্তবুদ্ধির আলোকে তাঁর বিচার করলে তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে না। আসলে, তিনি স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখেছিলেন বলেই হিন্দু ধর্ম কিংবা মার্কসীয় ধর্ম— কোনোটাই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে পারেননি।

আমার মনে আছে, আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক, অধ্যাপক আহমদ শরীফকে অধ্যাপক রায় জিজ্ঞাসা-য় লেখার অনুরোধ করে চিঠি লিখেছিলেন। শরীফ স্যার মার্ক্সবাদ কতোটা জানতেন, আমার জানা নেই, কিন্তু তিনি যা কিছু ধরতেন, তা প্যাশন নিয়েই ধরতেন। তাঁর কাছেও অধ্যাপক রায়ের এই দালালির খবর পৌঁছে গিয়েছিল। সুতরাং জিজ্ঞাসা-য় লেখা দেওয়ার আগে আমাকে একদিন জিজ্ঞেস করলেন : শিবনারায়ণ রায় সত্যি সত্যি সি.আই.এ.-র দালাল কিনা (যেন আমার কাছে সি.আই.এ.-র দালালদের তালিকা ছিল)।

তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাসের জন্যেও লোকেরা তাঁকে ভুল বুঝত বলে মনে হয়। সিটি কলেজের সংস্কৃত-বিশারদ অধ্যক্ষ—উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ শাস্ত্রীর পুত্র হিসেবে ছেলেবেলায় তিনি ধর্মীয় শিক্ষা কতোটা পেয়েছিলেন, তা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমি কখনো আলোচনা করিনি। তবে অতি ভোরে তাঁর পিতা ঘুম থেকে উঠে গায়ত্রী মন্ত্র আবৃত্তি করতেন। তার ফলে ঘরে যে-আধা রহস্যময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি হত, সেটা তাঁর মনের ওপর হয়তো ছাপ ফেলেছিল। কিন্তু আনুষ্ঠানিক ধর্ম তিনি ছেলেবেলায় পালন করতেন কি না অথবা পালন করার শিক্ষা লাভ করেছিলেন কি না, আমার তা জানা নেই। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি, তখন থেকে তাঁর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ধর্মের নামগন্ধও ছিল না। তিনি ইহলোক এবং মানুষকেই বাস্তব বলে জ্ঞান করতেন। কোনো আধিভৌতিক শক্তির প্রতি তাঁর বিশ্বাস ছিল না। উচ্চকণ্ঠে তিনি বলতেন যে, তিনি নাস্তিক। নাস্তিক এবং বিশ্বাসীদের মাঝখানে অনেকে থাকেন, যাঁরা সংশয়ে ভোগেন। তাঁর মধ্যে কেনো সংশয় ছিল না। অনেকে থাকেন, যাঁরা ধর্ম না-মানলেও অন্তত একজন সৃষ্টিকর্তার কথা বিশ্বাস করেন। তাঁর মধ্যে সে-বিশ্বাসও ছিল না। মৃত্যুর অনেক আগেই তিনি নির্দেশ দিয়ে গেছেন যে, তাঁর দেহ যেন শিক্ষার কাজে দেওয়া হয়। তাছাড়া, তিনি বলে গেছেন যে, শ্রাদ্ধসহ হিন্দুধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠানই যেন পালন করা না হয়।

আনুষ্ঠানিক ধর্মে তাঁর অবিশ্বাস তাঁর ব্যক্তিগত জীবন এবং চিন্তাধারাকে কীভাবে কতোটা প্রভাবিত করেছে, তার সঠিক মূল্যায়ন আমি করতে পারিনি। কিন্তু তাঁর অকৃত্রিম অসাম্প্রদায়িক মনোভাব যে এর ফলে জোরদার হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বস্তুত, আর পাঁচজন থেকে তাঁর চিন্তাধারা অতো স্বতন্ত্র ছিল বলে তাঁকে সবসময়ে চলতে হয়েছে স্রোতের বিরুদ্ধে। অনেক সময় একলা চলতে হয়েছে। কে কী মনে করবে, তা ভেবে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত নিতেন া। তাঁর একাধিক গ্রন্থের শিরোনাম তাঁর এই প্রথাবিরুদ্ধ একলা চলার মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়।

বিবিধ বিদ্যার প্রতি তাঁর ছিল অসীম আগ্রহ। খুব সম্ভব পিতার কাছ থেকেই তিনি এ আগ্রহ লাভ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একই সঙ্গে বাংলা, ইংরেজি এবং দর্শনের অধ্যাপক। বিচিত্র বিদ্যায় পিতার এই আগ্রহ তাঁকে ছেলেবেলা থেকেই নানা বিষয় পড়ার অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। তিনি পাশ করেছিলেন ইংরেজি আর দর্শনে। কিন্তু তাঁর আগ্রহ ছিল বহু বিষয়ে। তিনি বারবার করে ফিরে গেছেন সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বে। এমনকি, শিল্পকলা নিয়েও তিনি লেখাপড়া করেছেন। কিছুকাল আগে আমি বিলেতে বাঙালি সম্প্রদায়ের আগমন, বসতিস্থাপন এবং তাঁদের বর্তমান সামাজিক অবস্থান নিয়ে একটি বই প্রকাশ করেছি। বর্তমান বাঙালি সমাজ নিয়ে লিখব কি না, তা নিয়ে আমার মনে খানিকটা দ্বিধা ছিল। সে-কথা আমি তাঁকে জানিয়েছিলাম। তাতে কি আমাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়ে লেখেন। তিনি লেখেন যে, ইতিহাস নিঃসন্দেহে আগ্রহব্যঞ্জক বিষয়, কিন্তু বর্তমান সমাজ নিয়ে লেখাও কম আগ্রহের বিষয় নয়। তিনি আরো লেখেন যে, তিনি এই বইয়ের জন্য অপেক্ষা করে থাকবেন। আমার বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হওয়ার পরও তিনি এক মাসের বেশি বেঁচেছিলেন, অথচ আমার বই তিনি দেখে যাননি— এটা আমার কাছে এখন সত্যি একটা ক্ষোভের বিষয়।

পণ্ডিত অথবা সাহিত্যিক হিসেবে শিবনারায়ণ রায়ের মূল্যায়ন করা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা হবে। কারণ আমি তাঁর মতো পণ্ডিত অথবা সাহিত্যিক নই। তাছাড়া, আমি তাঁর অজস্র লেখার খুব সামান্যই পড়েছি। তিনি যেসব বিষয় নিয়ে লেখেন, তার অনেক কিছুতে আমার আগ্রহও সীমিত। আমি আমার এলাকার বাইরে ক্বচিৎ পা ফেলি। আমার নাম অনুসারে আমি মুরশিদের গোলাম মোটেই হতে পারিনি, হয়েছি কাজের গোলাম। নানা কাজের চাপে সত্যি আমি আমার আগ্রহের বিষয়ের বাইরে পড়ার সময় খুব কমই পাই। কিন্তু যখনই আমি তাঁর লেখা পড়েছি, তখনই মনে হয়েছে যে, বাংলায় লিখলেও তিনি বাঙালি পণ্ডিতদের মতো নন। তাঁর চোখ দিয়ে আমি তাই বাংলার সমাজ, ইতিহাস এবং সাহিত্যকে নতুন দৃষ্টিতে দেখতে পাই। তাছাড়া, তাঁর চিন্তাধারার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। তিনি যা বলতে চান, একেবারে সোজা সে-কথাটাই বলেন। মনে আছে, আমি একটি বিশ্ববিখ্যাত বেতার সংস্থার জন্যে নজরুল ইসলামের শতবর্ষ এবং হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতি নামে দুটি লম্বা ধারাবাহিক অনুষ্ঠান করি। দুটো সম্পর্কে আমি অনেকের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম। যাঁদের সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম, তাঁরা সবাই পণ্ডিত ব্যক্তি, কিন্তু শিবনারায়ণ রায়ের মতো এমন সুস্পষ্টভাবে কেউ তাঁদের

বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার।

আমার কাছে অবশ্য কেবল পণ্ডিত শিবনারায়ণ রায় নন, ব্যক্তি শিবনারায়ণও সমান শ্রদ্ধেয়। তাঁর আপাতদুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্ব এবং আনুষ্ঠানিকতার আড়ালে এমন একজন স্নেহশীল ব্যক্তির বসবাস ছিল তাঁর ভেতরে যে, একবার তাঁর সঙ্গে মিশলে সেটা চোখে না পড়ে পারে না। সেই যে তিরিশ বছর আগে মেলবোর্ন বিমানবন্দরে তাঁর সেই ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম, এখনো বারবার তাঁকে সেই স্বরূপেই দেখতে পাই। অন্যদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহারেও বারবার তাঁর এই ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই প্রকাশ পেত। তার ওপর আমার পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরো ঘনিষ্ঠ। আমার দুই সন্তানকে— বিশেষ করে ছোটোটিকে তিনি খুব ভালোবাসতেন। অনেক সময় সেই তাঁর কোলে উঠে নানা প্রশ্নবাণে তাঁকে বিদ্ধ করতে চেষ্টা করত। আমার স্ত্রী এবং আমার প্রতিও তাঁর এবং গীতা বৌদির অপরিসীম স্নেহ এবং ভালোবাসা চিরদিন অনুভব করেছি। মেলবোর্নে প্রতি সপ্তাহান্তে তাঁদের শহরতলির বাড়িতে গিয়ে অনেকটা সময় কাটিয়ে আসতাম। আমার পুত্রকন্যার জন্যে তিনি সাময়িকভাবে বয়স কমিয়ে শিশু হয়ে যেতেন। কীভাবে এদের মনোরঞ্জন করা যায়, তার বিবিধ উপায় ঠাওরাতেন।

তখন একটা জিনিস লক্ষ করেছিলাম— এতো সাহসী হলেও প্রযুক্তিতে তিনি ভয় পান। ভারতবিদ্যা বিভাগে এক্সটেনশনওয়ালা নতুন টেলিফোন এলে, তিনি তা ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। কোনোদিন টাইপরাইটার ব্যবহার করতেন না। কম্পিউটারের দিকে তিনি ভালো করে তাকিয়েও দেখেছেন কি না, সন্দেহ হয়। তবে গীতা বৌদির কাছে শুনেছি, মৃত্যুর আগে তিনি নাকি মোবাইল ফোন ব্যবহার করা কেবল শেখেননি, বরং ব্যবহার করতে বেশ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। নিজে কখনো গাড়িও চালাননি। সে-দায়িত্ব নিতে হয়েছিল বৌদিকে।

সন্তানদের ব্যাপারে তিনি শক্ত হতে পারতেন বলে আমার মনে হয়নি। মৈত্রেয়ী যখন একটি অস্ট্রেলীয় ছেলেকে বিয়ে করতে চাইল, তখন বৌদির বোধহয় ষোলো আনা সম্মতি ছিল না। কিন্তু অধ্যাপক রায় কেবল সম্মতি দেননি, বরং শেরওয়ানি পরে বিয়ের আসরে গিয়েছিলেন এবং নিজ হাতে বিশাল সাইজের আলুর চপ তৈরি করেছিলেন। অমিতাভ যখন কলকাতায় এসে মিতার সঙ্গে পরিচিত হয়েই তাঁকে বিয়ে করার ইচ্ছে জানায়, তখনো কোনো আপত্তি করেননি। এমনকি, অমিতাভ যে অতো ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও কোনো চাকরি না -করে বাড়িতে বেকার বসে থাকল, তাতেও কোনো বিশেষ আপত্তি করেছেন বলে শুনিনি।

শিবনারায়ণ রায় চলে যাওয়ায় একটি বিবেকী প্রতিবাদী কণ্ঠ হারিয়ে গেল। আপোস করতে জানে না, ভয় পায় না, আর পাঁচজন কী বলবে তার পরোয়া করে না—আমাদের চারদিকে জনারণ্য থাকলেও —এমন বিশিষ্ট ব্যক্তি বেশি নেই। সেই বিরল ব্যক্তিদেরই একজন বিদায় নিলেন। আপোসকামী স্বার্থান্ধ এবং মেরুদণ্ডহীন সমাজের জন্যে একটা মস্ত লোকসান। মস্ত নয়, আমাদের কাছে এ-লোকসান অপূরণীয়।